ভাঙা ঘরে মা মেরি। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জেরও আজ এইরকম অবস্থা

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের হোমল্যান্ড

জায়গাটার নামটাই ভারি অদ্ভুত, সকলের চেয়ে আলাদা। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ। এই নামে এর দো-আঁশলা পরিচয়, এর ইতিহাস মিশে আছে নামেই।

এরকম দো-মিশেল নাম তো আরো আছে; কেন ফ্রেজারগঞ্জ, ডালটনগঞ্জ, ফরবেসগঞ্জ? কিন্তু খুঁত খুঁত করে মন এখানেও। এসব নাম বড় বড় সাহেবদের, ব্রিটিশ আমলের কেউকেটা ছিলেন ঐরা প্রত্যেকেই। দণ্ডমুণ্ডের এসব তাবড় অধিকারীদের নামে একখানা ছোটখাটো গঞ্জ-শহরও থাকবে না তা কি হয়!

কিন্তু ম্যাকক্লাস্কি? ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাস তন্ন-তন্ন করে ঘাঁটলেও এই সাহেবের কোনো খবর পাওয়া যাবে না। তিনি না ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইংল্যান্ডের রানীর বড় চাকুরে, না ছিলেন চা-বাগান বা নীলকুঠির মালিক, না করেছেন কোনো অভ্র বা কয়লার খনি তুলে নিঃশেষ। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরেও ব্রিটিশ সরকারের আস্থাভাজন হননি।

তা হলে কে সেই সাদামাটা সাহেবটি যাঁর নামে 'ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ'?

একটি ব্যক্তিগত আবিষ্কার

ম্যাকক্লাস্কি সাহেবের স্মৃতিফলক

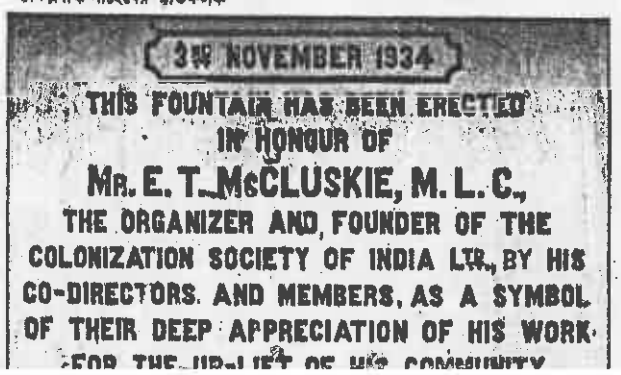

সে কথায় না হয় একটু পরে আসব। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জকে খুঁজে পেলাম কি করে তাই বলি আগে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর নাম যে কখনো শুনিনি তা নয়, গল্প-উপন্যাসেও উল্লেখ পেয়েছি। তবু ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যাব বলেই বেরোই নি সেবার।

প্রায় সাত-আট বছর আগে বর্ষাভেজা এক আগস্ট মাসে যাযাবরি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। দক্ষিণ বিহারের পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে ট্রেন চলেছে,

পথে আমার তো যেখানে মন চাইছে সেখানেই নেমে পড়ছি। ইচ্ছে হলে থাকছি দু-একদিন, নয়তো তল্পি গুটিয়ে আবার চলা। পত্রাতু-খিলাড়ি-মহুয়ামিলন— কি চমৎকার সব নাম, আর তেমনি সুন্দর শাল-কুসুম-মহুয়া-পলাশের বন, পাহাড় আর ঝরনা-নদী-নালা। এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতেই এক দুপুরে ট্রেনের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি একতলা লাল রঙের স্টেশন-বাড়ির গায়ে বড় বড় করে লেখা ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ ; আর নীচে ছোট্ট অক্ষরে— লাপরা। রেল লাইনের একপাশে নীচু বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে মৌমাছির মত ভিড় করেছে কিছু আদিবাসী, কিছু স্থানীয় বিহারী লোকজন। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজার আগেই

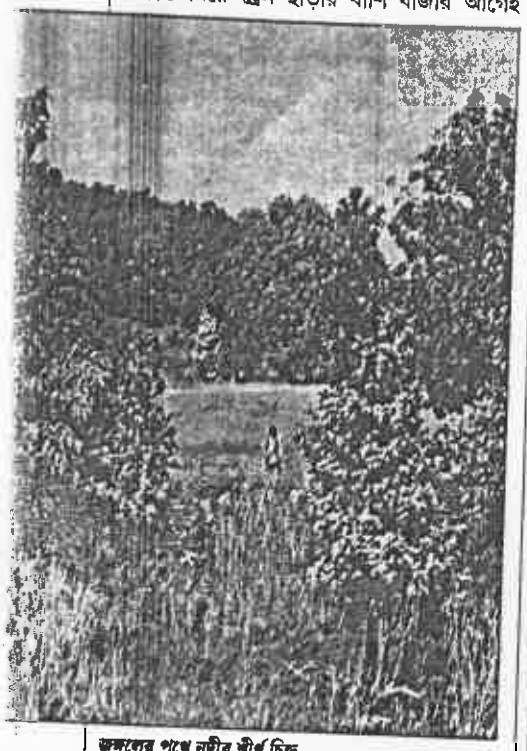

জঙ্গলের পথে নদীর শীর্ণ চিহ্ন

হাঁচোড়-পাঁচোড় করে নেমে পড়লাম। আর সেই যে নামলাম, সে যাত্রায় ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে থেকে এলাম পাক্কা একটি মাস। এর পরেও সেখানে গেছি বেশ কয়েকবার।

জায়গাটা ছোট্ট হলে কি হবে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভাল। স্টেশন থেকে ক'পা হাঁটতেই এক বৃদ্ধ বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ডেকে কথা বললেন, 'এখানে বেড়াতে এলেন বুঝি ?' একটু থেমে, 'তা ভাল, এ ভাল'। আবার চিন্তা করে, 'এখন তো লোকজন আসেই না এদিকে। এককালে মানুষে গমগম করত এই জায়গা, সাহেবলোক ঘোড়ায় চড়ে, ফিটন হাঁকিয়ে ঘুরতো। কোথায় গেল সেসব দিন ! এখানকার লোকে ছোটা-বিলেত বলত জায়গাটাকে।'

ছবি : কমলেন্দু সরকার

পুরনো স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে আছে কবরখানা

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে গেস্ট হাউসের বাগানের মধ্যে দেখি একটা বাঁধানো স্মৃতিফলক, ওপরের ফোয়ারাটা যে কতদিন কাজ করে না তার ঠিক নেই ; ফলকের লেখাগুলোও মধ্যে মধ্যে উঠে গেছে বলে ভাল করে পড়া যায় না। জঙ্গল ডিঙিয়ে কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে দেখলাম ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে : 'ইন অনার অফ মিঃ ই. টি. ম্যাকক্লাস্কি, দি অর্গানাইজার অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ দি কলোনাইজেশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া লিঃ' !

কে এই ম্যাকক্লাস্কি সাহেব ?

আঠারো শো বাহাত্তর সালে কলকাতায় এক স্কটিশ পিতার ঔরসে ভারতীয় মায়ের গর্ভে জন্ম হয় ই. টি. ম্যাকক্লাস্কির। বড় হয়ে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে বেশ নাম করেন তিনি। উনিশ শো বিশ দশকের শেষ ও তিরিশ দশকের প্রথম ভাগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ম্যাকক্লাস্কি। এছাড়া ছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ডমিসাইলড ইউরোপীয় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। কলকাতায় তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল বাইশ নম্বর পার্ক স্ট্রীট।

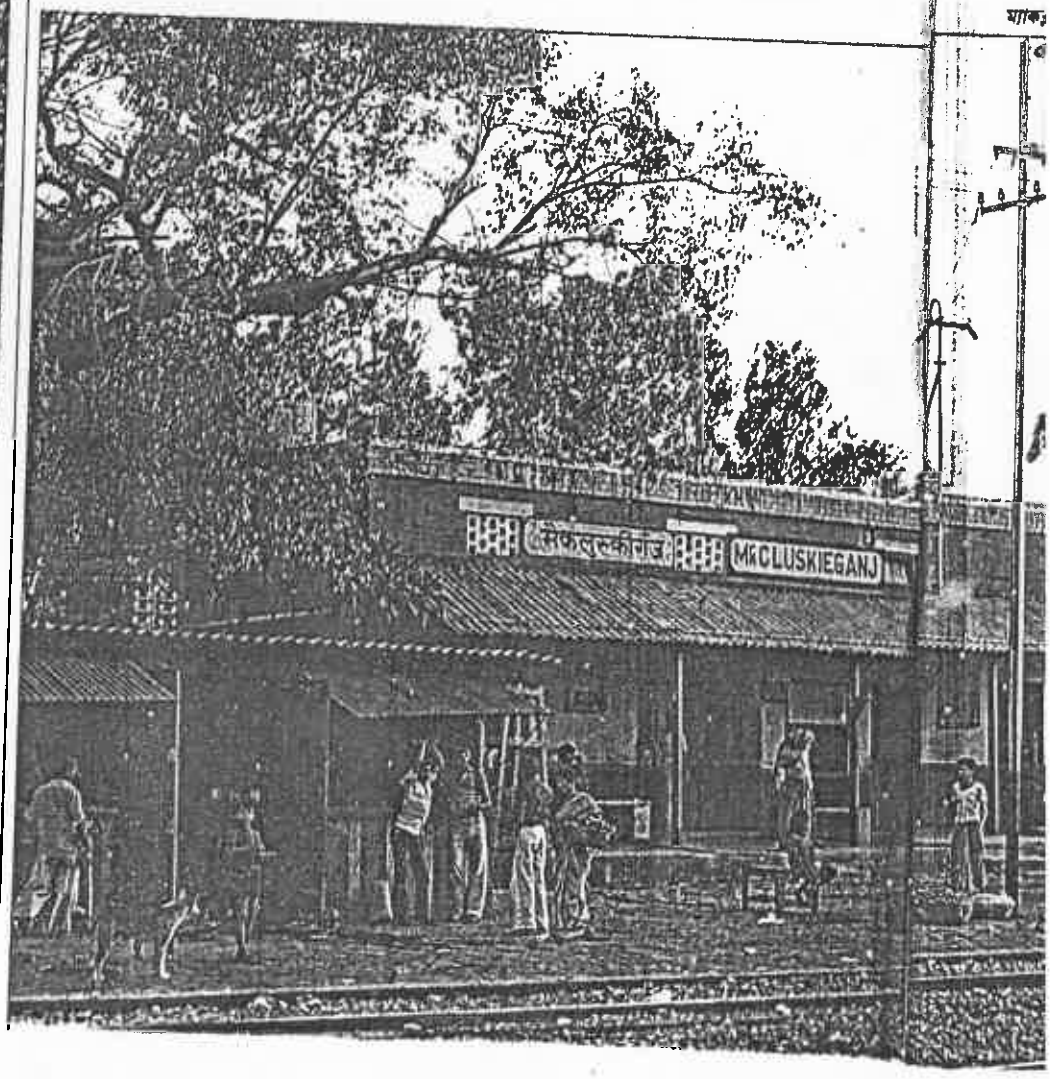

হাউসের
ৃতিফলক,
করে না
াও মধ্যে
যায় না।
দেখলাম
ফ মিঃ ই·
ফাউন্ডার
ক ইন্ডিয়া

ক্তায় এক
ার্ডে জন্ম
লকাতার
। উনিশ
র প্রথম
প্রতিনিধি
র সদস্য
ছিলেন
উরোপীয়
য় তাঁর
ট।

ম্যাকক্লাস্কির ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে তেমন কিছু খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তিনি বিয়ে করেননি। কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় তাঁর নশ্বর দেহ চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর মাত্র ৬৩ বছর বয়েসে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। ম্যাকক্লাস্কির মৃত্যুর পর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন ডাক্তার হেনরি গিডনী।

ব্রিটিশরা নথি রাখতে ভালবাসেন শুনেছি কিন্তু অ্যাংলোইন্ডিয়ানদের তেমন কোনো ইতিহাস তাঁরা লিখে রাখেননি। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরাই লিখেছেন গভীর দুঃখবোধ ও বঞ্চনার ইতিহাস। কলকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের পুরনো খবর খুঁজে বার করা তাই বেশ কঠিন। ম্যাকক্লাস্কি সম্পর্কেও এর চেয়ে বেশি কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

কিন্তু ওপরের তথ্যগুলির মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যার ফলে ম্যাকক্লাস্কির নামে একটা গোটা শহরের নামকরণ হতে পারে। ম্যাকক্লাস্কির স্বাতন্ত্র্য এজন্য নয় যে তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী, বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান নেতা।

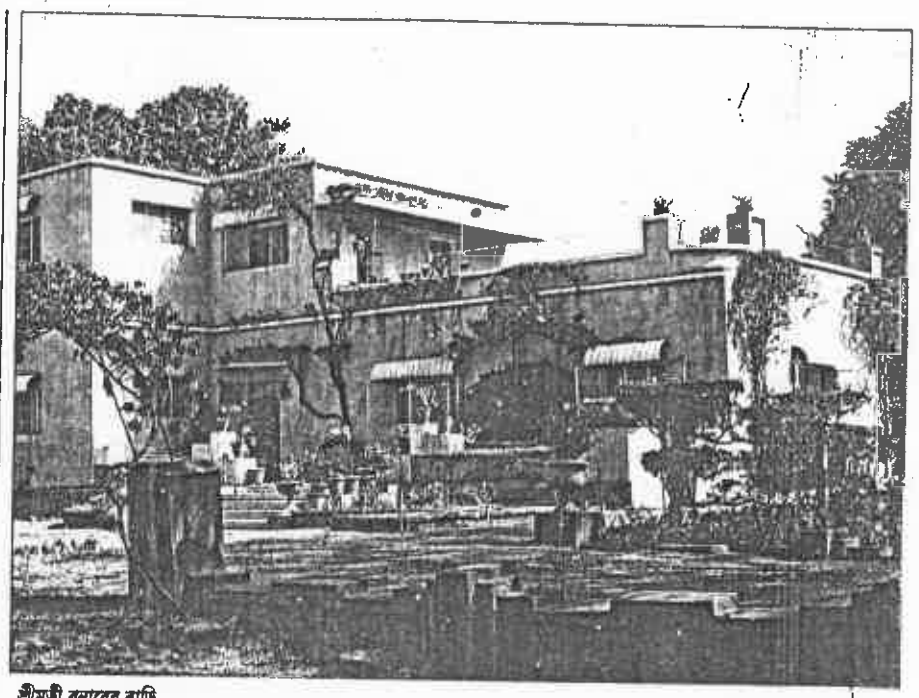

শ্রীমতী বনারের বাড়ি

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ (লাপরা) স্টেশন

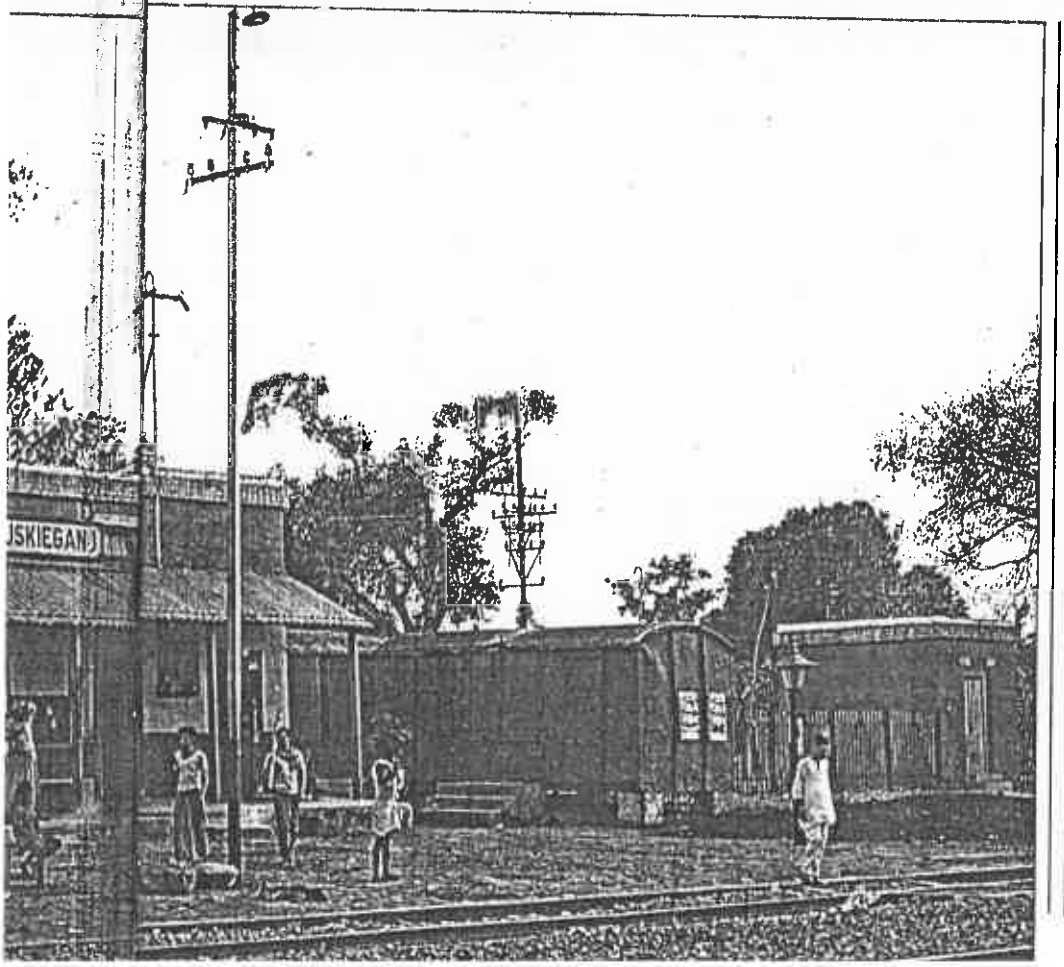

ম্যাকক্লাস্কির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অন্যখানে। খুব অল্প লোকেই জানে যে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের ছোট্ট একটু অলিখিত অংশের মূল কেন্দ্র ছিলেন তিনি ; ছিলেন একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা, এমন মানুষের একজন যাঁরা দেশ-কাল-গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে উঠে যান তাঁদের কর্মের দ্বারা। তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য ভারতের মাটিতে একটুখানি জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন আন্তরিকভাবে। ম্যাকক্লাস্কির সেই স্বপ্নকে এক্ষুনি আমরা জানবো, কিন্তু তার আগে দরকার যে সময়ে ম্যাকক্লাস্কি স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সময়টাকে বোঝা।

বাড়ির নাম রিমার'স ফলি— ভুল হয়েছিল কোথাও !

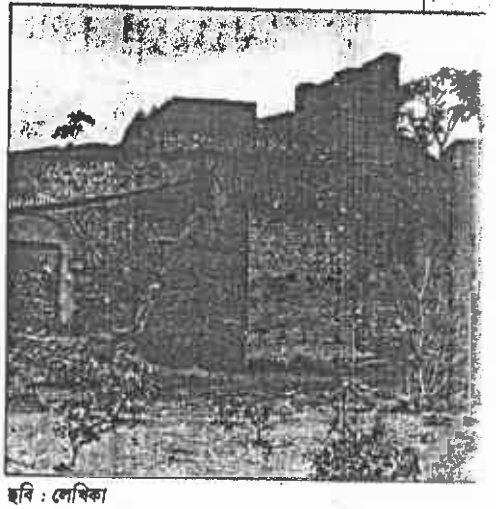

ছবি : লেখিকা

ভারতীয়দের সঙ্গে হাত-মেলাবার উপায়ও ছিল না। ইচ্ছে তো নয়ই, কারণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের শেখানোই হয়েছিল যে তারা উচ্চতর জীব ; ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। ব্রিটিশ রাজ এই বিচ্ছিন্নতাকে পাকা করার জন্য আরো নানা চাতুরি অবলম্বন করতে লাগল। একটা উদাহরণ দিই। রেলওয়েতে চাকরি পেতে গেলে প্রতিটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং নিতে হবে। এদিকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বলা হচ্ছে 'স্ট্যাটুটরি নেটিভস্ অফ ইন্ডিয়া', শান্তির সময়ে তারা ভারতীয় সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে মিশে হাসিমুখে কাজ করবে। অন্যদিকে ধর্মঘট বা দাঙ্গার সময়ে সে 'ব্রিটিশ ইউরোপীয় প্রজা' : ইউনিফর্ম পরে, রাইফেল হাতে তাকে অশান্তি বন্ধ করতে হবে। শান্তি ফিরে এলে সে আবার তার পুরনো পদে ফেরত গিয়ে ভারতীয় বন্ধুটির হাতে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করবে।

অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি।

আত্মসচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ

বাঙালি বা অন্যান্য ভারতীয়দের চোখে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা ছিল ব্রিটিশ সিংহের পা-চাটা কালা-সাহেব, আর ব্রিটিশদের কাছে তারা ছিল নেহাতই প্রয়োজনে ব্যবহার্য 'বস্তু' বিশেষ। কিন্তু কোনমতেই আদর করে ঘরে তোলার মত দামী বস্তু নয়। এদেশে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা যাতে তাদের শেকড় গেড়ে না ফেলে তার জন্য আইন করে শহরাঞ্চলের বাইরে ব্যক্তিগত জমি কেনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই মানুষগুলো ছিলেন পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক, সরকারি দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। এঁরা স্বপ্ন দেখতেন 'হোমের' যে দেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে, যাকে তাঁরা কোনদিন চোখেও দেখেন নি, দেখার সম্ভাবনাও নেই। অথচ এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে ইংল্যান্ডে তোমাদের ঠাঁই নেই ; নিজের পথ দেখো বাছারা, তোমরা এই ভারতেরই মাটির সন্তান।

এর নীট ফল হল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মানসজগতে এক চূড়ান্ত অস্তিত্বের সংকট। 'আমি কে', 'কোথায় আমার ঠাঁই' — এই চিন্তার ছাপ রয়েছে এসময়ের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রায় সব লেখাতেই। মোটামুটিভাবে বলা যায় এই সংকট থেকেই জন্ম নিয়েছিল এক আত্মসচেতনতা— স্বাধীনতার আগের প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর ধরে ভাবনা চলে এই দ্বিখণ্ডিত সত্তাকে কিভাবে জোড়া লাগিয়ে পূর্ণ করে তোলা যায়।

যুগে যুগে ইতিহাস দেখেছে যে যখনই কোন জাতির মধ্যে আত্মসচেতনতা গড়ে উঠেছে, তখনই তারা কোন না কোন ভূমিখন্ডের সঙ্গে নিজেকে এক বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে এই সমষ্টিগত বোধ যে আমরা 'এক' : ওরকম নয়, এরকমও নয়, আমরা আলাদা এক গোষ্ঠী। এই জাতীয়তাবোধকে চূড়ান্ত রূপ দিতে গেলে প্রয়োজন নিজস্ব 'দেশের'। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে আবার আমরা ফিরে আসছি সেই 'হোমের' প্রসঙ্গে। যে জাতির নিজস্ব কোন ভূগোল নেই, তারা কি করে নিজেদের সংগঠিত করবে !

ম্যাকক্লাস্কি সাহেব বুঝেছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের এই সমস্যার কথা। স্বদেশী আন্দোলনের দারুণ তোড়ে তখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইংরেজদের দেশত্যাগ ক্রমশই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনটাও আর অগ্রাহ্য করার মত নয়— মুসলিমদের একটা অংশ

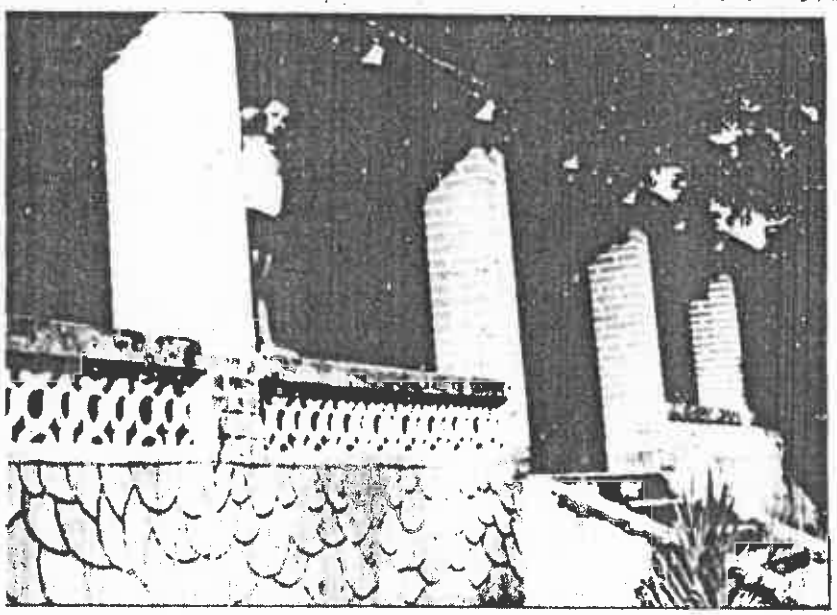

হাইল্যান্ড গেস্ট হাউস

স্বায়ত্তশাসনের দাবী করতে শুরু করেছে। স্বাধীন হলেও ভারত যে অখণ্ড থাকবে না তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এদিকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব বেশ কড়া ; মোটামুটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা হলে কি হবে, এই নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষেই তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা বিহ্বল, অসংগঠিত ; তখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছেন না কালা-চামড়ার নেটিভদের সঙ্গে কিভাবে মিলেমিশে থাকা যায় ? যাদের দিকে বন্দুক তাক করেছি এতদিন, তাদের রাজত্বে সংখ্যালঘু হয়ে বেঁচে থাকা যে অসম্ভব ! আর তাঁদের সেই 'হোমের' স্বপ্ন ?

এরকম চূড়ান্ত এক রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে, ১৯৩০ সালে ম্যাকক্লাস্কি প্রথম প্রকাশ করলেন তাঁর ম্যানিফেস্টো— 'দি ডন অফ এ নিউ এরা' —নতুন যুগের প্রভাত। অল্প কয়েক পাতার এই ছোট্ট বইখানিতে, বই না বলে একে পুস্তিকা বলাই ভাল, ম্যাকক্লাস্কি তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের ডাক দিলেন এক নতুন দেশ গড়ে তোলার— ইন্ডিয়া নয়, ইংল্যান্ড নয় 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়া' – কেবলমাত্র অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য আলাদা এক স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারতের আর পাঁচটা সম্প্রদায় যেমন 'মুলুকে' যায়, তাদের যেমন 'দেশ' থাকে, তেমনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও চাই। আর এই দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে। পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে (ম্যাকক্লাস্কির ভাষায় : 'ইউনিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন')।

মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা আশ্চর্যের বিষয় নয়, নতুন কিছুও নয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাকে স্যার টমাস মোরের লেখা 'ইউটোপিয়া' বইটি যে কি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল সেকথা এখনও গবেষকদের প্রিয় বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত ম্যাকক্লাস্কিও যে ইউটোপিয়ার আদর্শে নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখবেন এ-ও স্বাভাবিক। কল্পবাদী যুক্তির ওপরে ভিত্তি করে এরকম অনেক দেশ/ শহর পরিকল্পনা পশ্চিমের দেশগুলোতে গড়ে উঠেছে, লুই মামফোর্ড যাদের নাম দিয়েছেন 'রিকন্সট্রাকটিভ ইউটোপিয়া' —পুনর্গঠনমূলক কল্পরাজ্য। লক্ষ করার মত বিষয় হল ঠিক কোন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি এই ধরনের কল্পবাদী চিন্তার ডানা মেলতে সাহায্য করে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকতা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও ভারতীয় দুই-এর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা এবং জাগরূক আত্মসচেতনতা সাম্প্রদায়িক চেতনায় কল্পবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। সময়টাও

লক্ষ করুন, ১৯৩০ দশকের গোড়ার দিকে, যখন এই ধরনের স্বপ্নকে সফল করে তোলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

আজ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় সংখ্যার দিক থেকে এত ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে; ১৯৬০ সালে চাকরির রিজার্ভেশন উঠে যাবার পর ভারতের আর্থিক-সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের ভূমিকা, অল্প কিছু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ছাড়া, এত কমে গেছে যে আলাদা 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়া' শুনলে অবাস্তব, হাস্যকর, কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হয়তো মনে হয় না। একটা সার্ভে করে দেখছিলাম: অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্যের কাছে এই ধরনের প্রস্তাব অকল্পনীয়, অবাস্তব। শুধু তাই নয়, এই রকম প্রস্তাব যে কোনদিন উঠেছিল, চেষ্টা হয়েছিল 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার, তাও তাঁদের অজানা। ম্যাকস্কিগঞ্জের নাম শুনেছেন হয়তো কেউ কেউ, গেছেনও দু'চার জন। কিন্তু 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়া' হিসেবে ম্যাকস্কিগঞ্জকে তাঁরা বেশির ভাগই জানেন না।

কিন্তু আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে এখনকার চেয়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা তো অনেক বেশি ছিল বটেই, সামাজিক প্রতিপত্তিতেও তাঁদের স্থান ছিল ভারতীয় সমাজের বেশ উঁচুতে। স্বভাবতই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে মন্দ ছিল না। নিজেদের জন্য আলাদা 'হোমল্যান্ড' গড়ে তোলার ডাক তাঁদের অলীক মনে হয় নি। তখনো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি, কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় দলে দলে ভাগ্যান্বেষণে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা ছুটে যায় নি। তাই ম্যাকস্কিস্কির ডাকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন অনেকেই।

ম্যাকস্কিস্কির ইউটোপিয়া

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হোমল্যান্ডের প্রথম খসড়া তৈরি করেন ম্যাকস্কিস্কি আরো দুজনের সঙ্গে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রিভিউ'-এর ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সেই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই মাসেরই শেষের দিকে বাঙ্গালোরে এক স্কটিশ সাহেবের চাষবাসের দক্ষতা দেখে উদ্বুদ্ধ হন আবার। ফিরে এসে নভেম্বরে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সার্কুলার বিলি করেন। এতে ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব উপনিবেশ গড়ে তোলার রূপরেখা। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ম্যাকস্কিস্কি দেখা করলেন তখনকার ভাইসরয় লর্ড আরউইনের সঙ্গে। পরের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি গিয়ে চেষ্টা করলেন, সরকারি আর্থিক সাহায্য পাওয়ার। তবে এসব চেষ্টায় আদৌ কোনো ফল মেলে নি— সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য বা বিনে পয়সার জমি— কোন প্রতিশ্রুতিই পাওয়া যায় নি। তখন ম্যাকস্কিস্কি চেষ্টা করলেন সমবায়ের আকারে তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে। যাতে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের সংকট চিরকালের মত দূর হয়।

অন্যান্য বড় বড় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নেতাদের মনেও 'হোমল্যান্ডের' প্রস্তাব ভালই লেগেছিল। ফলে গঠিত হল 'কলোনাইজেশন সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া' যার স্থাপক-চেয়ারম্যান হলেন ম্যাকস্কিস্কি। ১৬ মে, ১৯৩৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত এই সোসাইটির মূলধন ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা— প্রতিটি দশ টাকা দামের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে ভাগ করা। ম্যাকস্কিস্কির ভাগনে পার্সিভাল ড্যামজেন হলেন সোসাইটির সেক্রেটারি। জুলাই ১৯৩২ থেকে প্রকাশ হতে লাগল সোসাইটির মুখপত্র, মাসিক জার্নাল 'দি কলোনাইজেশন অবজারভার'। সদস্যদের মধ্য থেকে গঠন করা হল একটি 'বোর্ড অফ ডিরেকটরস'।

অনেক জায়গায় জমি দেখেছিলেন ম্যাকস্কিস্কি, তবে শেষ অবধি মনস্থির করলেন ছোটনাগপুরের রাঁচি জেলার দশটি গ্রাম: লাপরা, হেসালঙ, কোঙ্কা, মায়াপুর, মন্ডুলিয়া, দুলি, কাদোল, রামদাগা, চামা ও চামরাঙ্গা— ১০,০০০ একরের বিশাল এক এলাকা। কলকাতা থেকে ২৮৮ মাইল, রাঁচি থেকে ৩৭, বরকাকানা জংশন থেকে ৩৩, জামসেদপুর থেকে ১৩২ মাইল দূরে লাপরা স্টেশন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরো জমির বন্দোবস্ত করার সুযোগ ছিল। মাটির উর্বরতা মন্দ নয়, জমিও খুব পাথুরে নয়। চারটি নদী বয়ে গেছে চারিদিক দিয়ে: উত্তরে দামোদর, দক্ষিণে বালা, পূর্বে সফি ও পশ্চিমে চটি নালা। মোটকথা, বেশ সুবিধেজনক অবস্থান। ছোটনাগপুরের মহারাজা প্রতাপ উদয় নাথ সাহাদেও-র সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হল ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে। এঁর মাধ্যমে মহারাজ কুমার নন্দ কিশোর নাথ সাহাদেও-র কাছ থেকে জমি কেনা হল।

কলোনাইজেশন সোসাইটির সাধারণ উদ্দেশ্য ঘোষিত হল 'স্বাধীনতা'। তবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে কলোনাইজেশন অবজারভারের বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে বেশ পার্থক্যও আছে। কোথাও বলা হচ্ছে, 'হিয়ার ইজ আওয়ার চান্স টু গ্রো অ্যান্ড এক্সপ্যান্ড অ্যান্ড বিকাম এ রিয়েল কমিউনিটি অ্যান্ড এ নেশন', কোথাও "টু এসটাবলিশ এ 'হোম' ফর দি কমিউনিটি অ্যান্ড দাস হ্যাভ এ স্টেক ইন আওয়ার ওন কানট্রি," আবার কোথাও লক্ষ্যগুলো যেভাবে লেখা হয়েছে তা পড়লে মনে হয় কোন ব্যবসায়িক সংস্থার রিপোর্ট পড়ছি।

ব্যবসায় দোষ নেই। অনুরূপ সংগঠন চালাতে গেলে লাভের ঝুলির দিকে খেয়াল রাখতেই হবে। এইরকম অধিকাংশ কল্পবাদী 'দেশ'-ই নষ্ট হয়ে গেছে অভাব ও পরিচালনার ব্যর্থতায়। কিন্তু বাণিজ্যিক মানসিকতা ও পরোপকারের উদারতা— এই দুই-এর মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দোদুল্যমান হওয়াও কোন কাজের কথা নয়। আর এই দুই-এর ঠিক মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নেওয়াও বেশ কঠিন। ম্যাকস্কিস্কির 'অ্যাংলো-ইন্ডিয়া'য় টাকা নিয়ে আসবে চাকরি থেকে সদ্য অবসর নেওয়া লোকগুলি, যাঁদের হাতে মোটা পুঁজি রয়েছে। অথচ ম্যাকস্কিস্কির পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য দরকার তরতাজা উদ্যমী খাটিয়ে যুবক বা খুব বেশি হলে মাঝবয়সী দম্পতিদের। এঁদেরই ক্ষমতা আছে অচেনা পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর, বন্ধ্যা মাটিকে ফলবতী করে গঞ্জকে সার্থক করে তোলার সহিষ্ণুতা। অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বেশি সংখ্যায় এলে জায়গাটা একটা শান্ত 'রিসর্ট' ধরনের হয়ে উঠবে— এ-জিনিস ম্যাকস্কিস্কি চাননি।

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ইতিহাস রচয়িতা আওয়েন মেল বলেছেন ঠিক এই কারণেই ম্যাকস্কিস্কিগঞ্জও সার্থক হয়ে ওঠেনি: 'দি সেটলারস অ্যাট ম্যাকস্কিস্কিগঞ্জ ওয়্যার মেইনলি রিটায়ার্ড ওল্ড জেন্টলমেন ছু··· ওয়্যার নট পারটিকুলারলি ইগার টু মেক এ সাকসেস অফ এগ্রিকালচার অর দি কলোনি দে হ্যাড কোঅপারেটেড ইন এসট্যাবলিশিং দেয়ার লাইভস ডিড নট ডিপেন্ড অন ইট··· অ্যান্ড··· ম্যাকস্কিস্কিগঞ্জ গেভ দেম দি কোয়ায়েট অ্যান্ড বিউটি অফ দি কান্ট্রিসাইড ছুইচ দে সো ব্যাডলি নীডেড ইন দি আইড্‌লনেস অফ সুপার অ্যানুয়েশন।'

অতীত বীক্ষণ

ওপরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য নয়। পেছনদিকে হেঠে সেই পুরনো আমলে যদি ফিরে যাই তাহলে দেখবো যে একদম গোড়ায় যাঁরা লাপরায় এসে ঠাঁই গাড়েন তাঁদের বেশিরভাগই মাঝবয়সী দম্পতি। এঁরা এসেছিলেন প্রধানত পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে; আবার করাচী-লাহোর, ভূসাওয়াল, আন্দামান, সিকিম ও বার্মার মত দূর থেকেও উৎসাহী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা সদস্য হচ্ছিলেন কলোনাইজেশন সোসাইটির। একদম প্রথমদিকে বসতি স্থাপন করেন উইকেট ও কিংহ্যাম পরিবার দুটি। এই দুই পরিবারই এসেছিলেন তাঁদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে নিয়ে। সম্ভবত ম্যাকস্কিস্কি ঠিক এধরনের সদস্যই বেশি চেয়েছিলেন।

জঙ্গল কেটে বসত গড়বে যে মানুষগুলো, তারা খাবে কি? ম্যাকস্কিস্কি চেয়েছিলেন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা চাষবাস করে আধুনিক খামারবাড়ি গড়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন কাটাবে। কিন্তু দেখা গেল এধরনের প্রস্তাবকে লাভজনক করে তোলার জন্য দরকার বিশাল জমির—অন্তত্তপক্ষে ১০০ একর। এত বেশি জমি নিয়েছিলেন কোলকাতার বুথ সাহেব ও ভুসাওয়ালের মিঃ ব্যালান্টাইন। এঁদের ফলের বাগান এখনো রয়েছে। তবে এত বড় জমি নিয়ে বিরাট স্কেলে চাষবাস শুরু করার সামর্থ্য অনেকেরই ছিল না, তাই সোসাইটি বাধ্য হয়েছিলেন ছোট আয়তনের ভূমিখণ্ড বন্টনে। তাঁদের মতে একটা কুড়ি একরের প্লট ম্যাকস্কিস্কিগঞ্জের উদ্দেশ্যের পক্ষে আদর্শ: এর মধ্যে চার একরের উপর বাড়ি ও সবজি বাগান,

আর বাকি ষোল একরে চাষ এবং গরু-মহিষ বা হাঁস-মুরগি পালন।

নীতির সঙ্গে বড় ধরনের আপস করেও ম্যাকক্লাস্কি রেহাই পাননি। 'গঞ্জের' বাকি সদস্যদের মধ্যে ষাট জনের জমির আয়তনই ছিল পাঁচ একরের কম ; আরো উনষাট জনের জমি ছিল পাঁচ থেকে দশ একরের মধ্যে। অর্থাৎ শহুরে মধ্যবিত্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা খোলামেলা জায়গায় সামান্য কিছু ফসল ফলিয়ে বাস করার কথা ভাবছিলেন, ম্যাকক্লাস্কির সার্থক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা তাঁদের মাথায় ছিল না। এই বর্গের লোকজনের জন্য ১৯৩৫-এর পরে সোসাইটি 'অ্যাবসেন্ট সেটলার' নামে একটা প্রকল্প চালু করেন। এতে সোসাইটি অর্থের বিনিময়ে কোনো সদস্যের জমিতে বাংলো-টাইপের বাড়ি তৈরি ও চাষ করার দায়িত্ব নেন। পরে জমির মালিক যখন ইচ্ছে জমি-বাড়ির দখল নিতে পারতেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ আরেকটা বড় ধরনের আপস, কারণ অনুপস্থিত সদস্যদের নিয়ে আর যা-ই হোক,'হোম' হয় না।

এর পরেও কলোনাইজেশন সোসাইটি ১৯৩৯ সালে গ্রহণ করেন পাঁচসালা পরিকল্পনা যাতে রাস্তা-ঘাট তৈরি ও বিশেষ করে বাদাম ও গমের চাষের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। স্থায়ীভাবে গঞ্জে বসবাস করবে, এমন সদস্যদের আকর্ষণ করার জন্য নেওয়া হল এরিনস আইল এস্টেট (শেল্কা গ্রামে ১৫টি এক একরের প্লট) ; পেনশনার'স এরিয়া (রেস্ট হাউসের দক্ষিণে ১৫টি ছোট প্লট) ; মিনিয়েচার টাউন এরিয়া (৪০টি প্লট) ; উডল্যান্ডস এরিয়া (১২টি প্লট) ; ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া (৬টি প্লট) ; এবং গিডনি টাউন। ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের আবাসিক চেহারা যে বাড়ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

চাষবাস তেমন গড়ে ওঠেনি তার একটা কারণ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে উদ্যমের অভাব। দারুণ দারিদ্র্যেও এই সম্প্রদায়ের লোকজন আশা করে যেতেন সরকারী বেসরকারী দাক্ষিণ্য পাওয়ার। আর শহরের দরিদ্রতম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মজুরির লোভ দেখিয়ে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে টেনে আনার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও গড়ে ওঠেনি। পরিশ্রম করেছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা ; রেললাইন পেতেছে, টেলিগ্রাফের খুঁটি গেড়েছে, জঙ্গল কেটে খাল খুঁড়ে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে পোক্ত করেছে। কিন্তু তার জাত্যভিমান শিখিয়েছে চাষের ক্ষেতে শারীরিক পরিশ্রম ছোটলোক নেটিভদের কাজ।

তবুও মানতেই হবে জমি কিনে চাষবাসের প্রস্তাবে অর্থনৈতিক বাস্তবতার ঘাটতি নেই। সমস্যা ছিল অন্যখানে। চিরকাল শহরজীবনে শহুরে জীবিকায় অভ্যস্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের হাতে লাঙল তোলায়। চাষবাসের কথা ম্যাকক্লাস্কি কেন ভাবলেন ? তার কারণ হতে পারে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব। তাছাড়া ভারতে থেকে, সরকারী-বেসরকারী দয়াদাক্ষিণ্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরোতে হলেও গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত না করে উপায় ছিল না।

গোড়ার দিকে ম্যাকক্লাস্কির হোমল্যান্ডের আদত নাম—লাপরা ব্যবহার হচ্ছিল। পরে সোসাইটির সদস্যরা 'গ্র্যাটিচিউড, জাস্টিস ও অ্যাপ্রেসিয়েশন' দেখানোর জন্য নাম বদলের প্রস্তাব করেন। প্রথম দিকে 'ম্যাকফিল্ড' 'ম্যাকসফিল্ড' বা 'ম্যাকভ্যালি'-র কথা ওঠে। ঠিক হয় যে 'ম্যাকক্লাস্কি'র পুরো নামটাই ব্যবহার করলে তাৎপর্য বেশি হবে। 'ম্যাকক্লাস্কিবাগ', 'ম্যাকক্লাস্কি ভ্যালি', 'ম্যাকক্লাস্কি'স ভ্যালি' বা 'ম্যাকক্লাস্কি শায়ার' —এসব নামও বেশ গুরুত্ব পাচ্ছিল তর্ক-বিতর্কে। আবার অন্যদিকে নাম বদলের বিপক্ষেও মতামত কম পড়েনি। শেষ অবধি ১৯৩৫ সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি কলোনির নাম বদলে রাখা হল 'ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ', আর ওই দিনটিকে চিহ্নিত করা হল 'ফাউন্ডার'স ডে' হিসাবে। এই নামের মধ্যেই রয়েছে দোআঁশলা ভাব, যা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়দের বৈশিষ্ট্য। সদস্যদেরও পছন্দ হল এই নাম, কারণ 'ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ ইজ টু বি বোথ দি মুলুক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি হোম ফর দি কমিউনিটি'!

একটি স্বপ্নের মৃত্যু

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ যে 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়া' হয়ে উঠতে পারেনি, একথা তো আজ মোটামুটি সকলেরই জানা। এর কারণ কিছুটা ম্যাকক্লাস্কির অকালমৃত্যু, কিছুটা ছোটনাগপুরের রুক্ষ প্রকৃতিকে চাষের কাজে লাগানোর ব্যর্থতা, কিছুটা আর্থিক কুপরিচালনা, কিছুটা ব্রিটিশ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আর কিছুটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ দশকের গোড়া পর্যন্ত কলোনাইজেশন অবজারভার প্রতি মাসে না হলেও তিন-চার মাসে একখানি বের হতো। বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগে আর সেটুকুও সম্ভব হল না।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের অনুকরণে আরো কতকগুলি 'কলোনি' গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল, দেরাদুনের কাছে মাজরা এর অন্যতম। সার হেনরি গিডনিও আন্দামানে এরকম উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে দুটো ভিন্ন মতাবলম্বী দলের সৃষ্টি হয় : প্রথম দল যারা ম্যাকক্লাস্কির অনুগত, তাঁরা একটিই 'হোমল্যান্ডের' সমর্থক, আর অন্যদিকে একদল চাইছিলেন আরো অজস্র এরকম কলোনি গড়ে তুলতে।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ কি এবং কেন, এই নিয়ে বোঝার ভুল তখনও ছিল, এখনও আছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের আবাসন কলোনি অনেকগুলোই গড়ে তোলা যায়, কিন্তু 'হোমল্যান্ড' একটাই হতে পারে।

কিন্তু ইতিহাস বলে যে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ 'হোমল্যান্ড' হয়ে উঠতে পারেনি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরা, যাঁদের সামর্থ্য ও সুযোগ ছিল, ভারত ছেড়ে চলে গেছেন বিদেশে ; আর যাঁরা তা পারেননি বা স্বেচ্ছায় এদেশে থেকে গেছেন তাঁরা নিজেদের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা কিছুটা বজায় রেখেও ভারতের মূল জনস্রোতে মিশে যাচ্ছেন।

আজকের ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ দিয়ে শুরু করেছিলাম, শেষেও আবার না হয় বর্তমানেই ফিরে আসা যাক। জায়গাটার চরিত্র দ্রুত বদলাচ্ছে : এই ক'বছর আগেও যেখানে ছিল হাইল্যান্ড গেস্ট হাউস, আজ সেখানে গমগম করে বাচ্চাদের স্কুল চলছে। খিলাড়ির কয়লাখনি সিমেন্ট কলের কর্মীদের ছেলেপুলেরা ইংরেজিতে লেখাপড়া শিখতে আসে সেখানে। সামনের ছোট নালা, যেটায় নেমে পা ভিজিয়ে ওপারে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, তার ওপর দিয়ে কালভার্ট তৈরি হয়েছে। কবরখানা দিনকে দিন ভরে উঠছে, আর অন্যদিকে কমছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসংখ্যা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন অনেকগুলো সম্পত্তি কিনে ফেলেছেন ; তাদের সকলেই যে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে পাকাপাকিভাবে থাকেন এমন নয়। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের হোমল্যান্ড' হিসাবে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জকে জানেন, এমন লোক আঙুলে গোনা যাবে।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জের প্রাসঙ্গিকতা

সময়ের বুক চিরে এসব পুরনো কথা টেনে আনার যৌক্তিকতা কোনখানে ? আজকের দিনে ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ কি আদৌ প্রাসঙ্গিক ?

আমার ধারণা ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ কোন পরিস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল, তা যদি বোঝা যায়, তাহলে সমসাময়িক অনেকগুলো বিষয়ের ওপরে আলো পড়বে। অর্থাৎ একদল মানুষ কিভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল এবং সত্তার সংকটের সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য হোমল্যান্ড গড়ে তুলতে চেয়েছিল, কেমন ছিল সেই ইউটোপিয়া, আর কেমনভাবেই বা ঘটল তার অবশ্যম্ভাবী পতন—এই তথ্যগুলো আমাদের শিখিয়ে দেবে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের সমস্যার মোকাবিলা কিভাবে করা উচিত।

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ তাই এত বছর পরেও আমাদের কাছে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শুধু বেড়াবার জায়গা নয়। বন, পাহাড়, নদী, ফুল সমন্বিত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র নয়। একটি আধফোটা স্বপ্নের মতো অবক্ষয়কবলিত স্মৃতি শহর। যাঁরা ছিলেন এই প্রচেষ্টার নায়ক তাঁদের বংশধরেরা জীবিকার সংগ্রামে চলে গেছেন সাগরপারে। অবলুপ্ত হয়েছে একটি সংস্কৃতি। করুণ সংগীতের মতো এখানে বাতাস কাঁদে বনাঞ্চলে। পরিত্যক্ত বাগানে পড়ে থাকে স্মৃতির ঝরাপাতা। বায়ুসেবনকারী কখনো কেউ যদি এসে পড়েন, ইতিহাসের দিকে পেছন ফিরে তিনি খুঁজতে থাকেন আর একটি ভ্রমণকেন্দ্রের পতনের কারণ ; কিন্তু এ তো 'চেঞ্জে'র জায়গা নয়, একটি কমিউনিটির আশা-আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় স্বপ্নের সমাধিভূমি।